বিষয়: ইনোভেশন অ্যান্ড এন্টারপ্রিনিউরশিপ

৭ম পর্ব
ইলেকট্রনিক্স,সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি

উপস্থাপনায়ঃ
মোঃ সাইফুল ইসলাম খান
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (নন টেক/একাউন্টিং)
ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

প্রথম অধ্যায়ঃ শিল্পোদ্যোগের সংজ্ঞা

ভূমিকা এবং প্রকৃতিঃ শিল্পোদ্যোগ বলতে কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত কর্মদ্যোগকে বোঝায়। অর্থাৎ, ব্যাপক অর্থে, মুনাফা অর্জনের আশায় লোকসানের সম্ভাবনা জেনেও ঝুঁকি নিয়ে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়াকেই শিল্পোদ্যোগ বলে।

শিল্পোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী

যে বা যিনি নতুন নতুন পণ্য, সেবা বা ব্যবসা সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন এবং অনিশ্চয়তা মোকাবেলা করে সেগুলো পরিচালনা অব্যাহত রাখেন, তাকে উদ্যোক্তা বলা হয়। শিল্প উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে, যথাঃ

ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য	মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য	অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য	সামাজিক বৈশিষ্ট্য
১) শিক্ষা	১) দুরদৃষ্টি	১) অভিজ্ঞতা	১) সমন্বয়ক
২) সাংগঠনিক ক্ষমতা	২) উদ্ভাবনী শক্তি	২) মূলধন ব্যবহারের ক্ষমতা	২) গতিশীল নেতৃত্ব
৩) ধৈর্য	৩) ঝুঁকি গ্রহণ ক্ষমতা	৩) উৎপাদক	৩) নমনীয়তা এবং ভালো ব্যবহার
৪) বুদ্ধিমত্তা, আকর্ষণীয়	৪) মানসিক শক্তি এবং	৪) বিশেষায়ণ	৪) স্বাধীনচেতা

শিল্পোদ্যোক্তার গুণাবলীঃ এর মধ্যে রয়েছে দূরদৃষ্টি, নেতৃত্ব, ঝুঁকি গ্রহণ, উদ্ভাবনী

শিল্পোদ্যোক্তার শ্রেণীবিভাগ

একটি দেশের সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিবেশ ব্যবসা এর প্রকৃতি এবং উদ্যোক্তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিগত গুণাবলীর ভিত্তিতে উদ্যোক্তাদের নিম্নরূপে বিভক্ত করা যেতে পারে

বৈশিষ্ট্য, গুনাগুন ও দক্ষতার ভিত্তিতে	মালিকানা ভিত্তিক উদ্যোক্তা	কারবারের প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণীবিভাগ
১) কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন উদ্যোক্তা।	১) সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তা	১) শিল্পোদ্যোক্তা
২) সুযোগ সন্ধানী উদ্যোক্তা	২) একক বা ব্যাপকভিত্তিক উদ্যোক্তা	২) বাণিজ্যিক উদ্যোক্তা
৩) উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্যোক্তা		৩) সেবা পরিবেশন উদ্যোক্তা
৪) অনুকরণ প্রিয় উদ্যোক্তা		

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ শিল্পোদ্যোগ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন

ভূমিকা এবং প্রকৃতিঃ বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শিল্প উদ্যোগের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্বল্প ব্যায়ে উৎকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের জন্য দক্ষ উদ্যোক্তার প্রয়োজন। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি দেশের দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় উৎপাদন, জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায় তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে অনুন্নত দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়ন সাধন করে অনুন্নত অর্থনীতিকে উন্নত স্তরে নিয়ে যাওয়াকে বোঝায়।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়া

অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে দেশের প্রকৃত জাতীয় আয় বাড়ে। তবে উন্নয়নের হার যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয় তখনই মাথাপিছু প্রকৃত আর বৃদ্ধি পায়। প্রক্রিয়া বলতে কতগুলো নির্দিষ্ট শক্তির সম্মিলিত কাজকে বোঝায়, যে শক্তিসমূহ একটি দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে এবং তার ফলশ্রুতিতে কোনো কোনো গুণকের পরিবর্তন আনে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাধারণ ফল হলো একটি অর্থনীতির জাতীয় উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি যা দীর্ঘ মেয়াদ সৃষ্ট ও সুষম বন্টন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে পারে।

মূলধন যোগান বা সঞ্চয়ের হার

কোন দেশের বিনিয়োগের জন্য মূলধন যোগান একটি প্রয়োজনীয় গুণক। এ মূলধন দেশের অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক উৎস হতে যোগান সম্ভব। দেশের অভ্যন্তরীণ সূত্র বলতে দেশীয় সঞ্চয় ও বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক ঋণদানকে বোঝায়। বৈদেশিক সূত্র হতে মূলধন আসে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে। স্মিথ ও রিকার্ডোর মতে, মুনাফা অর্জনের চাহিদা পুঁজি-পতিদের তার মূলধনের লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজতে বাধ্য করে। মুনাফা অর্জনের জন্য তারা তাদের অর্জিত মুনাফাকে পুনঃবিনিয়োগ করে এভাবে বেশি মুনাফা জমা করেন। মূলধন যোগানের এ প্রক্রিয়া অর্থনীতিতে ধারাবাহিকভাবে কতগুলো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, যার ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়

প্রযুক্তির উন্নয়ন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকা

দেশের শিল্পায়নে প্রযুক্তি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। উদ্যোক্তাগণ উৎপাদনের নতুন পদ্ধতির সূচনা, উৎপাদনের নতুন উপকরণের আবিষ্কার ইত্যাদির মাধ্যমে নতুনত্বের সূচনা করেন। উন্নয়নশীল দেশে এ জাতীয় উদ্ভাবনী কার্যাবলী নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক বিকাশে সহায়ক। প্রযুক্তির উন্নয়ন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে উদ্যোক্তার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। তা নিম্নের রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো,

উদ্যোক্তা নতুন উৎপন্ন দ্রব্যের আবিষ্কারক

বর্তমান বিশ্বে উৎপাদনের আধুনিক জটিল পদ্ধতিতে যেখানে প্রতিযোগিতামূলক বাজার বিদ্যমান সেখানে উদ্যোক্তাদেরকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে পণ্য বা দ্রব্য সামগ্রী এর বর্তমান চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় কেবল নতুন কোন উৎপন্ন দ্রব্য আবিষ্কারের মাধ্যমে। দ্রব্যের চাহিদা এই বৃদ্ধি উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণকে বৃদ্ধি করে। ফলে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের লাভ ও আয়ের পরিমাণ বাড়ে। একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করা সম্ভব কেবলমাত্র দ্রব্যটির গুণগত মানের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে।

নতুন বাজার আবিষ্কারে শিল্পোদ্যোক্তা

নতুন বাজার আবিষ্কারের অর্থ হলো উৎপন্ন দ্রব্য বা সেবা সামগ্রীর বিপণন ঝুঁকি হ্রাস এবং পণ্যের চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি করা, যার ফলে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অর্থনীতিতে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির অর্থ হলো বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়া। নতুন বাজার সৃষ্টির ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়, যার ফল হলো ব্যাপক উৎপাদন ও বর্ধিত বিক্রয়। এই বর্ধিত কর্মকাণ্ডের ফলে অধিক পরিমাণে মুনাফা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ কারণে বিনিয়োগকারী বা শিল্প উদ্যোক্তাগণ সব সময় নতুন বাজার সৃষ্টিতে আগ্রহী থাকেন। এছাড়া ভোক্তার চাহিদা সময়ের বিবর্তনে পরিবর্তনশীল। তাই বাজারে নতুন পণ্যের আবির্ভাব, পণ্যের মান বৃদ্ধি, পণ্যের নতুন মাত্রা সংযোজন, পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি ইত্যাদি অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ এন্টারপ্রিনিউরশিপ উন্নয়নের পরিবেশ

মাইক্রো বা ব্যাষ্টিক পরিবেশের সংজ্ঞাঃ যেসকল নিয়ন্ত্রণযোগ্য পক্ষ, শক্তি ও উপাদান বিপণন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে সেগুলোকে ব্যাষ্টিক পরিবেশ বলে। পরিবেশের এরূপ পক্ষ, শক্তি বা পারিপার্শ্বিক উপাদানগুলো প্রত্যক্ষভাবে বিপণন কার্যাবলীর উপর প্রভাব সৃষ্টি করে। তবে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে বিপণনকারী এগুলোর প্রভাব কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই পরিবেশের উপাদান গুলো হচ্ছে, যথাঃ

1. প্রতিযোগী
2. সরবরাহকারী
3. কর্মচারী
4. শেয়ারহোল্ডার
5. মাধ্যম
6. গ্রাহক

ম্যাক্রো বা সামষ্টিক পরিবেশ

যেসকল অনিয়ন্ত্রণযোগ্য পক্ষ, শক্তি ও উপাদান বিপণন কার্যক্রমে প্ররোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে সেগুলোর সম্মিলিত প্রভাবকে ম্যাক্রো বা সামষ্টিক পরিবেশ বলে। পরিবেশের এরূপ পক্ষ, শক্তি বা পারিপার্শ্বিক উপাদানগুলো প্ররোক্ষভাবে বিপণন কার্যাবলীর উপর প্রভাব সৃষ্টি করে। বিপণনকারী এগুলোর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এই পরিবেশের উপাদানগুলো হচ্ছে, যথাঃ

1. বাস্তুবিদ্যা বাহ্যিক পরিবেশ।
2. প্রযুক্তিগত পরিবেশ।
3. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ।
4. অর্থনৈতিক পরিবেশ।
5. রাজনৈতিক ও আইনগত পরিবেশ।

ব্যষ্টিক পরিবেশ এবং সামষ্টিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য

ব্যষ্টিক পরিবেশ	পার্থক্যের বিষয়	সামষ্টিক পরিবেশ
ব্যষ্টিক পরিবেশের উপাদানগুলো বিপণনের কার্যক্রমের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে	প্রভাবের ধরন	সমষ্টিক পরিবেশের উপাদানগুলো বিপণন কার্যক্রমের উপর পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে
ব্যষ্টিক পরিবেশের আওতা অত্যন্ত ছোট	আওতা	সমষ্টিক পরিবেশের আওতা অনেক বড়
ব্যষ্টিক পরিবেশের উপাদানগুলো কোম্পানির কার্যক্রমের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত	অবস্থান	সামষ্টিক পরিবেশের উপাদানগুলোর প্রভাব বিপণনকারীর পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না
ব্যষ্টিক পরিবেশের উপাদানগুলোর প্রভাব	নিয়ন্ত্রণ	সামষ্টিক পরিবেশের উপাদানগুলোর প্রভাব

চতুর্থ অধ্যায়ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্বে শিল্পোদ্যোগ

ভূমিকা এবং প্রকৃতিঃ বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শিল্প উদ্যোগের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যেসকল তত্ত্বসমূহ একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য শিল্পোদ্যোগের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করে, তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের শিল্পোদ্যোগ তত্ত্ব বলে। শিল্পোদ্যোগে দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, জনশক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার ও সর্বোপরি অর্থনৈতিক

ডেভিড ম্যাকলেল্যান্ডের "কৃতিত্বার্জন চাহিদা তত্ত্ব"

শিল্প উদ্যোগের ওপর বিভিন্ন প্রকার মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বাবলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ডেভিড ম্যাকলেল্যান্ডের কৃতিত্বার্জনের চাহিদা তত্ত্বটি। ম্যাকলেল্যান্ডের মতে, কৃতিত্বার্জন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের উদ্যোক্তার মতো আচার-আচরণ করার সম্ভাবনা বেশি। তাই যে সমাজে শিল্প উদ্যোক্তা বেশি, সে সমাজে কৃতিত্বার্জনের চাহিদাও বেশি। আবার যে সমাজে কৃতিত্বার্জনের চাহিদা বেশি, সে সমাজে শিল্পোদ্যোক্তাও বেশি। সে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নও বেশি। তাই ম্যাকলেল্যান্ড কৃতিত্বার্জন চাহিদার স্তর বাড়ানোর সুপারিশ করেছেন যাতে করে শিল্পোদ্যোগ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমান তালে ঘটে। ম্যাকলেল্যান্ডের মতে উচ্চ কৃতিত্বার্জনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে, যথাঃ

1. নমনীয় ঝুঁকি গ্রহণের আগ্রহ এবং কঠোর পরিশ্রম করার প্রবণতা।
2. লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রতি আশ্বাস এবং বিশ্বাস হতে আনন্দ লাভ।
3. উদ্দেশ্য অর্জন যদি বড় হয় তাহলে সাফল্য লাভের উপলব্ধি বেশি বড় হয়।
4. যেকোনো প্রচেষ্টার সাফল্য কিংবা ব্যর্থতার কারণ জানার প্রয়োজনীয়তা।
5. অগ্রিম পরিকল্পনা করার ক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রম পরিকল্পিতভাবে পরিচালিত করা।
6. উন্নত মানের পণ্যের প্রতি আগ্রহী থাকা।

কৃতিত্বার্জন চাহিদা তত্ত্বটি বাস্তবসম্মত একটি মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব। এটি কাজের সফলতা ও আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং আগ্রহ হতে নতুন নতুন উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয় যা জাতীয় উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি অর্জনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত ম্যালথাসের তত্ত্ব

প্রখ্যাত ইংরেজ ধর্মযাজক ও অর্থনীতিবিদ থমাস রবার্ট ম্যালথাসের মতে প্রকৃতিতে প্রাকৃতিকভাবে মানুষের খাদ্য ধীর গাণিতিক হারে বাড়ে, কিন্তু অভাব এবং বিপর্যয় তাকে বিরত না করলে মানুষ নিজে দ্রুত জ্যামিতিক হারে বাড়ে। অর্থাৎ, এই তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে, যথাঃ

1. জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়ে।
2. খাদ্য উৎপাদন গাণিতিক হারে বাড়ে।
3. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খাদ্য উৎপাদনের হারের চেয়ে বেশি হওয়ার পরিণতিতে জনাধিক্য সমস্যা দেখা দিবে।
4. সমস্যা সমাধানের প্রতিকার হিসেবে ম্যালথাস প্রতিষেধক ব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক প্রতিরোধ, এ দুটি উপায়ের কথা উল্লেখ করেন।

এ অবস্থা মোকাবিলার বিষয়ে তার বক্তব্য, জন্মহার সীমিত রেখে জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে মিল রাখা। আর এটা সম্ভব না হলে প্রাকৃতিক নিরোধ ব্যবস্থা, যেমনঃ আত্মহত্যা, শিশুহত্যা, অখাদ্য ও কুখাদ্য ভক্ষণ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে জনসংখ্যা হ্রাস পেয়ে পুনরায় খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষিত হবে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পর্যায়ক্রমিক তত্ত্ব (রস্টোর তত্ত্ব)

রস্টোর তত্ত্ব অনুযায়ী একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুন্নত অবস্থা হতে উন্নত পর্যায়ে আসতে অনেক সময় লাগে। এই সময়কালে অনুন্নত হতে উন্নত অবস্থায় পৌঁছানোর স্তরকে কতিপয় স্তর বা পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। রস্টোর সমাজকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিহ্নিত করে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন, যথাঃ

1. **প্রাথমিক স্তরঃ** এই স্তরে উৎপাদন থাকে সীমিত। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার কোনো উন্নতি হয় না। উৎপাদন পদ্ধতি থাকে প্রাচীন আমলের।
2. **প্রস্তুতি পর্বঃ** এটি এমন এক যুগ যখন প্রাথমিক স্তর হতে সমাজ উঠতি পর্বে পদার্পণ করে।
3. **উঠতি স্তর বা পর্যায়ঃ** এ যুগে নতুন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে। শিল্প কারখানার লাভের হার বাড়তে থাকে।
4. **আত্মনির্ভরশীল স্তরঃ** এই স্তরে সবকিছু পাকাপোক্ত হয়ে উঠে। উৎপাদন বাড়াবার জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি ও কলা-কৌশল নিয়ে পরীক্ষা চলতে থাকে এবং দিন দিন সার্বিক উন্নতি ঘটতে থাকে।
5. **অত্যধিক ভোগ পর্বঃ** অত্যধিক ভোগ পর্ব হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সর্বশেষ পর্ব। এই পর্বে অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত থাকে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্যুমপিটারিয়ান তত্ত্ব

স্যুমপিটারের মতে, শিল্পোদ্যোক্তার বহুমুখী গুণাবলী ও তা বাস্তবায়নের উপরই অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে। এই কর্মকাণ্ডগুলো উদ্ভাবনমূলক হতে পারে। তার এ ধারণা অনুযায়ী দেশের অর্থনীতি বারবার একই থাকছে অর্থাৎ বৃত্তের আকারে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাই এ স্থবিরতাকে ভেঙ্গে দিলেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকা ঘুরতে থাকবে। আর সেজন্য দরকার স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবসায়িক উদ্যোগ। উৎপাদন জগতের এই নয়া উদ্ভাবন বা কৌশলকে পাঁচভাবে প্রয়োগ করা যাবে, যথাঃ

1. নতুন ও উন্নত পণ্য উদ্ভাবনঃ শিল্পোদ্যোক্তা নতুন এবং উন্নত পণ্যের উদ্ভাবন করেন।
2. প্রক্রিয়াগত উদ্ভাবনঃ উৎপাদনের নতুন কৌশল উদ্ভাবন করে দ্রুত উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করেন।
3. নতুন বাজার উদ্ভাবনঃ নতুন বাজার সৃষ্টি এবং বাজারজাতকরণের দক্ষতা অর্জন।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ বাংলাদেশে শিল্প ধারণার উৎস বা সূত্রসমূহ

ভূমিকা ও প্রকৃতিঃ একটি সফল ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তনের চাবিকাঠি হল বাস্তবসম্মত ধারণা, সঠিক জনবলের সমষ্টি ও প্রাথমিক প্রয়োজনীয় মূলধন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে একক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে সঠিক শিল্প ধারণার সূত্রপাত করা। যেখান থেকে একজন সম্ভাব্য শিল্পোদ্যোক্তা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ধারণা গ্রহণ করতে পারেন তাকে শিল্প ধারণার উৎস বা সূত্র বলে।

সমচ্ছেদ বিন্দু বা ব্রেক ইভেন পয়েন্টঃ সমচ্ছেদ বিন্দু বা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বলতে এমন একটি স্তরকে বোঝায় যে পরিমাণ উৎপাদন করলে মোট উৎপাদন খরচ এবং বিক্রয়লব্ধ আয় সমান হয়। অর্থাৎ, এটি এমন একটি বিন্দু যেখানে মোট খরচের পরিমাণ ও মোট বিক্রয়ের পরিমাণ সমান থাকে। উক্ত বিন্দুতে উৎপাদন করা সম্ভব হলে প্রতিষ্ঠানের একদিকে যেমন কোন লাভ হবে না, অন্যদিকে লোকসানও হবে না।

বাংলাদেশে শিল্প ধারণার বিভিন্ন ধরনের উৎস বা সূত্রসমূহঃ বাংলাদেশে

বাংলাদেশে শিল্প-উদ্যোগ ধারণার আনুষ্ঠানিক উৎস বা সূত্রসমূহ

১) বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়।	৬) বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক।	১১) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
২) শিল্প বিভাগ।	৭) বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা।	১২) ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লিজিং কোম্পানি অব বাংলাদেশ।
৩) সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও তাদের নীতিমালা সংক্রান্ত দলিলসমূহ।	৮) বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা।	১৩) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড।
৪) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও	৯) রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক	১৪) ব্যাংক অব স্মল

বাংলাদেশে শিল্প-উদ্যোগ ধারণার আনুষ্ঠানিক উৎস বা সূত্রসমূহ

১৬) মাইডাস।	২১) বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সাহায্য কেন্দ্র (বিটাক)	২৬) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ
১৭) বাণিজ্যিক ব্যাংক।	২২) রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা (ইপিজেড)	২৭) বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ।
১৮) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)	২৩) আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ দপ্তর (ইইসিডি)	২৮) বাংলাদেশ হস্তচালিত তাঁত শিল্প দ্রব্য রপ্তানি কর্পোরেশন।
১৯) ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন অ্যান্ড	২৪) চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	২৯) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন কমিটি (ব্রাক)

বাংলাদেশে শিল্প-উদ্যোগ ধারণার অআনুষ্ঠানিক উৎস বা সূত্রসমূহ

১) ব্যবসায়ী ও শিল্পের সাথে যোগাযোগ (i) ক্রেতাদের নিকট থেকে ধারণা (ii) পাইকার ও সরবরাহকারীর নিকট থেকে ধারণা। (iii) ব্যবসায় প্রদর্শনী ও শোরুম থেকে ধারণা।	৩) পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান।
২) পেশাধারীদের সাথে যোগাযোগ।	৪) জাতীয় নেতাদের নিকট থেকে ধারণা।

কারবারের আকার নির্ধারণকারী উপাদানসমূহ

কারবার সংগঠনের আকার নির্ধারণকারী উপাদানসমূহকে যেসকল ভাগে ভাগ করা যায় তার কতগুলো যোগানভিত্তিক আর কতগুলো চাহিদাভিত্তিক। যোগানভিত্তিক উপাদানসমূহ কারবার সংগঠনের আয়তন বৃদ্ধির সামর্থ্য ঠিক করে দেয় এবং প্রবৃদ্ধির দক্ষতা নির্দেশ করে। অপরদিকে চাহিদাভিত্তিক উপাদানসমূহ কারবার সংগঠনের বর্ধিত আয়তনের ফলে যে বর্ধিত উৎপাদন হয়, সমাজে যেসব পণ্য বা সেবার প্রয়োজন বা চাহিদা কতটুকু আছে তা নির্দেশ করে। কারবারের আকার নির্ধারণকারী উপাদানসমূহ হচ্ছে, যথাঃ

যোগানভিত্তিক উপাদানসমূহ	চাহিদাভিত্তিক উপাদানসমূহ
১) ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য কাঁচামালের বিভাজন এবং বিশেষায়ণ।	১) কারবারের প্রকৃত আয়তন।
২) প্রযুক্তির অবস্থা।	২) পণ্যে সমজাতীয়তা বা পৃথকীকরণের মাত্রা।
৩) বাজার ও কারবারের পরিপক্কতা।	৩) ভৌগোলিক রূপায়ন।
৪) মূলধনের প্রয়োজনীয়তা।	৪) সময়ের ধরন।
৫) ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা।	৫) মূল্য স্থিতিস্থাপকতা।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ প্রকল্প নির্বাচন এবং আর্থিক পরিকল্পনা

প্রকল্পের সংজ্ঞা এবং ধারণাঃ প্রকল্প বলতে একটি সুনির্দিষ্ট কার্যাবলীকে বোঝায় যেখানে মুনাফা অর্জনের জন্য অর্থ ব্যয় করা হয়। অর্থাৎ, কোন পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে মূলধন বিনিয়োগের প্রস্তাবকেই প্রকল্প বলে। এটি নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনে গৃহীত বিনিয়োগ কর্মপ্রক্রিয়া।

অপরদিকে, প্রকল্প ধারণা বলতে প্রকল্প সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাকে বোঝায়। কোন প্রকল্পে নিয়োজিত থেকে অথবা কোন প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে অথবা কোন প্রকল্প সম্পর্কে আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের নিকট থেকে জেনে অভিজ্ঞতা অর্জনকে প্রকল্প ধারণা বলে। পূর্ব ধারণা বা অভিজ্ঞতা না থাকলে হঠাৎ করে সম্পূর্ণ নতুনধর্মী কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করা বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। উদ্যোক্তার সৃজনশীল মানসিকতা হতে প্রকল্প ধারণার বিষয়টি উদ্ভব হয়েছে।

প্রকল্প ধারণার দিকনির্দেশনা

প্রকল্প ধারণাগুলোর দিকনির্দেশনা বিভিন্নভাবে হতে পারে, যেমনঃ

1. যে কাজে নিজের শখ বা আগ্রহ আছে এমন বিষয় থেকে ব্যবসার ধারণা করা।
2. কোন একটি জিনিসের অভাবের কারণ অনুসন্ধান করা।
3. অন্য প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা বা উৎপাদকের পণ্য বা সেবাসমূহের অসুবিধা বা খারাপ দিক পর্যবেক্ষণ করা এবং তা থেকে নতুন ধারণা সংগ্রহ করা।
4. কোন একটি সাধারণ জিনিসের বিশেষ ব্যবহারের আলোকে নতুন ধারণার চিন্তা করা।
5. পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ থেকে নতুন কিছু উৎপাদনের সুযোগ অনুসন্ধান ও উদ্ভাবন করা।
6. আধুনিক কলাকৌশল ও নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ থেকে ব্যবসার ধারণা সৃষ্টি করা।
7. বিশেষ পরিস্থিতি দ্বারা সৃষ্ট চাহিদা পূরণের প্রেক্ষিতে নতুন ধারণা লাভ করা।
8. বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণ করার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা।
9. সর্বোপরি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসার ক্ষেত্রে পণ্য মিশ্রণের বা নতুন পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে বিক্রয় বৃদ্ধির ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া।

প্রকল্প ধারণার উৎস

প্রকল্প ধারণা হচ্ছে প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়। প্রকল্পের ধারণার উৎসগুলো হচ্ছে, যথাঃ

1. সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতি
2. পণ্যের চাহিদা সরবরাহ বিশ্লেষণ
3. গবেষণা ও উন্নয়ন
4. আঞ্চলিক শিল্পায়ন জরিপ
5. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মসূচি
6. রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা
7. দেশের আমদানি রপ্তানির অবস্থা এবং শিল্প উৎপাদনের পরিমাণ
8. বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান
9. সরকারি বেসরকারি সংস্থা
10. বাণিজ্যমেলা

প্রকল্পের কারিগরি দিক

প্রকল্পের কারিগরি সম্ভাব্যতা বা যৌক্তিকতা যেকোন প্রকল্পের সার্বিক সম্ভাব্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রকল্প হাতে নেয়ার পূর্বেই প্রকল্পের কারিগরি, প্রযুক্তিগত বা ব্যবহারিক দিকটির সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণকে কারিগরি মূল্যায়ন বলে। প্রকল্পের কারিগরি দিকগুলো হচ্ছে, যথাঃ

1. প্রকল্পের আকার
2. প্রকল্পের অবস্থান
3. উৎপাদন পদ্ধতি
4. যন্ত্রপাতি ও কল কব্জা
5. কাঁচামালের প্রাপ্যতা
6. দক্ষ শ্রমিকের প্রাপ্যতা

আর্থিক পরিকল্পনার সংজ্ঞা

অর্থ এবং পরিকল্পনা শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে আর্থিক পরিকল্পনা বিষয়টির উদ্ভব ঘটেছে। অর্থ বলতে বিনিময়ের মাধ্যমকে বোঝায় আর পরিকল্পনা হল লক্ষ্য অর্জনে সম্পাদিত কার্যাবলীর পূর্ব নকশা বা সিদ্ধান্ত। সুতরাং আর্থিক পরিকল্পনা বলতে অর্থের চাহিদা নিরূপণ, উৎস নির্ধারণ, সংরক্ষণ, অর্থের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে আগাম নকশা প্রণয়নসহ ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বোঝায়। আর্থিক পরিকল্পনার প্রধান কার্যাবলীগুলো হচ্ছে, যথাঃ

1. প্রাতিষ্ঠানিক অর্থের চাহিদা নিরূপণ।
2. অর্থের উৎস এবং সংগ্রহ পদ্ধতি নির্ধারণ।
3. অর্থ সংরক্ষণ ও ব্যবহার কৌশল নির্ধারণ।
4. প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় নির্ধারণ।
5. লভ্যাংশ বন্টন, সঞ্চিত তহবিল প্রস্তুত এবং আর্থিক নীতি প্রণয়ন।

দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক পরিকল্পনা এবং এর উৎসসমূহ

যে পরিকল্পনা পাঁচ বছর হতে অধিক সময়ের জন্য গ্রহণ করা হয়, তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। একটি নতুন কারবার বা শিল্প প্রতিষ্ঠান শুরু করার ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্ব শর্ত হলো স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগের পরিমাণ পূর্বে নির্ধারণ করা। এর জন্য উদ্যোক্তাকে তার প্রস্তাবিত কারবারের আকৃতি, প্রকৃতি এবং কারিগরি বিষয়াবলী সম্পর্কে অবগত হতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক পরিকল্পনার উৎসসমূহ হচ্ছে, যথাঃ

1. মালিকগণ।
2. শিল্প ব্যাংক।
3. বীমা কোম্পানিসমূহ।
4. বিনিয়োগ সংস্থাসমূহ।
5. বাণিজ্যিক ব্যাংক।
6. দায় গ্রাহক।
7. ঋণপত্র।
8. সঞ্চিতি তহবিল।
9. অবচয় তহবিল।
10. বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমনঃ বিশ্ব ব্যাংক, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক, ইসলামী উন্নয়ন সংস্থা ইত্যাদি।

স্বল্পমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা এবং এর উৎসসমূহ

যে পরিকল্পনা সর্বোচ্চ এক বছর সময়ের জন্য গ্রহণ করা হয়, তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। শিল্পোদ্যোক্তাকে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক পরিকল্পনার পাশাপাশি স্বল্পমেয়াদী আর্থিক পরিকল্পনাও প্রণয়ন করতে হয়। মূলত কারবার বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ এবং চলতি সম্পদসমূহের জন্য স্বল্পমেয়াদী আর্থিক পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। স্বল্পমেয়াদী আর্থিক পরিকল্পনার উৎসসমূহ হচ্ছে, যথাঃ

1. ব্যবসায়িক ঋণ
2. বাণিজ্যিক ব্যাংক
3. অর্থ সংস্থানকারী প্রতিষ্ঠান
4. খরিদ্দারগণ
5. ফড়িয়া বা দালাল
6. গ্রামীণ ব্যাংক
7. বাণিজ্যিক পেপার হাউজ
8. সমবায় ঋণদান সমিতি
9. বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যাংক
10. এনজিও

শিল্প ধারণা মূল্যায়নের সংজ্ঞা এবং নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ

যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন শিল্প উদ্যোক্তা তার শিল্প ধারণাসমূহের মূল্যায়ন করেন সেই প্রক্রিয়াকে শিল্প ধারণার মূল্যায়ন বলে। একটি নতুন শিল্প ধারণা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত মুখ্য উপাদানগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয, যথাঃ

1. উদ্যোক্তার সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।
2. উদ্যোক্তার ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী।
3. বাহ্যিক উপাদানসমূহ, যেমনঃ সামাজিক পরিবেশ, দেশের নিয়ম নীতি ইত্যাদি।

কারবারের আর্থিক দিকসমূহের মূল্যায়নঃ কারবারের সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য এর আর্থিক দিকসমূহের মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারবারের কয়েকটি আর্থিক দিক হচ্ছে, যথাঃ

1. সম্ভাব্য পরীক্ষণ।
2. বাজার সমীক্ষা।
3. খরচের হিসাব।
4. আর্থিক বিশ্লেষণ।